

দেশের মাটি

অসীম চট্টোপাধ্যায়

গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধানের ঘর । একদিকে একটা খাট সবুজ আর সাদা বেড কভার ঢাকা । অন্যদিকে একটা সস্তা সোফা সেট । মাঝখানে একটা জানালা রঙ্গীন পর্দা দেওয়া । জানালা দিয়ে বাইরের লোক মুখ বাড়িয়ে ঘরের লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারে । ঘরের মধ্যে এক ৫০-৫২ বছরের বয়স্ক লোক লুঙ্গি আর রঙ্গীন পাঞ্জাবী পরে বসে খবরের কেগজ পড়ছে । বেলা তিনটে আন্দাজ হবে । জানালার পর্দা সরিয়ে একটি দাড়িওলা মুখ দেখা যায় ।

দাড়ি : আদাব সীতারামবাবু . . .

সীতারাম : কে গফুর ? আরে বাইরে কেন, ভেতরে এস । (গফুর ভিতরে আসে) বল কী খবর ।

গফুর : খবর ভাল নয় । সেই কথাটাই জানাতে এলাম । আমাদের খুব হ্যারাচমেন্ট করছে ।

সীতারাম : কারা ? কেন ? (মাটির দিকে তাকিয়ে)

গফুর : সীমান্ত রক্ষীরা । হিন্দুস্থানের বর্ডারে যত গ্রাম আছে সব জায়গায় ঢুকে ঢুকে অত্যাচার চালাচ্ছে, বৈধ কাগজ থাকা সত্ত্বেও মুসলমান লোকদের অনুপ্রবেশকারী বলে বাংলাদেশে ঠেলে দিচ্ছে । তাদের জমি জায়গা কেড়ে নিচ্ছে । আমাদের সুরুলগাছী গ্রামেও শুনছি হামলা হবে ।

সীতারাম : না না যতখানি শুনছ তত কিছু নয় । যাদের বৈধ কাগজ আছে তাদের কিছু করবে না ।

তোমাদের ভয় কি ! সবারই ত ভোটের খাতায় নাম লেখান আছে । কেউ বাদ পড়েছে কি ? এখন ত কারেকশন করা সোজা হয়ে গেছে । আমি বলে দিলেই কাগজ তৈরি হয়ে যাবে । আগের ঝামেলা আর নেই ।

গফুর : কিন্তু একটা কথা নিবেদন করি । ভোটের লিষ্টে নাম তোলার খরচ ত দিন দিন বেড়েই চলেছে হুজুর । গরীব লোকগুলো কি করে পারবে ? আপনারা একটু না দেখলে কি করে আমরা বাঁচব হুজুর ।

সীতারাম : ও গফুর, এটা কি কথা বলছ ! তোমরা পার্টির জন্য ভোট দিচ্ছ, পার্টিও তোমাদের দেখছে গরীবের দুঃখ দূর করার সরকারী প্রকল্পগুলো বেশীরভাগই ত আমি তোমাদের দিয়ে দিই । তোমাদের ভোটেই ত এখন থেকে আমাদের স্বাস্থ্যদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন । আমাদের গ্রামের কত বড় গর্ব ।

গফুর : আজে সেই কথাই ত বলতেছি । বৈধ কাগজ করার টাকা না কমালে আমরা ঠিক করেছি কথাটা মন্ত্রী মশাইয়ের দরবারে পৌঁছে দেব । আমাদের ভোট ত বড় কম নয় । মন্ত্রীমশাই আমাদের বিশ্বাস এর বিহিত করবেন । আর একান্তই যদি না করেন তাহলে আমরাও আলাদা প্রার্থী দেব পঞ্চায়েত নির্বাচনে ।

সীতারাম : আরে আরে, মাথা গরম কোরো না । তোমরা আমাদের ছেড়ে কোথায় যাবে । আর আমরাই বা কেন যেতে দেব । আমি কদিন পরেই কোলকাতা যাব । তখন পার্টির অফিসের লোকদের সঙ্গে বসে একটা গাইড লাইন ঠিক করে নেওয়া যাবে, যাতে তোমাদের কেউ হ্যারাস না করে । আর দল টল কী সব বলছ । তোমাদের সীতারামদা যতদিন আছে কেউ কিছু করতে পারবে না - কোনো ভাবনা নেই ।

গফুর : আচ্ছা আজ চলি বাবু । আদাব ।

(গফুর চলে যায় । সীতারাম চলে যাওয়ার পরে বলে “যাওয়াচ্ছি । খবরের কাগজে একটা ফোন করার ওয়াস্তা । তারপর বাছাধনদের আর দেখতে হবে না ।” জানালা দিয়ে আর একটা মুখ উঁকি দেয়)

বাইরের মুখটি : সীতারাম’দা আছেন নাকি ?

সীতারাম : আরে রাজেন যে ! এস এস, তোমার জন্যই ত বসে আছি । কই তারা এসেছে ?

রাজেন : আজে আমরা এক সঙ্গেই এসেছি । এই চল ।

(রাজেন আর দুজন মহিলা ঘরে ঢোকে । একজনের বয়স ১৮-১৯ ; অপরজন ৪০এর ঘরে)

সীতারাম : এরাই তাহলে ? বেশ বেশ -- বোস । তা করে ফিরলে ?

রাজেন : আজ্ঞে, গতকাল সন্ধ্যাবেলায় ফিরেছি । ফিরেই আপনার খোঁজ করেছি ।

সীতারাম : রাস্তায় কোনো গন্ডগোল হয়নি ত ?

রাজেন : বর্ডারে ত আগেই বলা ছিল । সন্ধ্যাবেলায় যখন গরুগুলো ফিরে আসে সেই সঙ্গে আমরাও মাথায় গামছা বেঁধে লাঠি হাতে রাখালদের সঙ্গে এপারে চলে এসেছি । পৌষ মাসে তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা নামে, লোকজন ব্যাটাছেলে না মেয়েছেলে ঠাউর করা যায় না । কেউ কিছু বলে নি ।

সীতারাম : তা তোমার ভগ্নীপতি করে আসবে ?

রাজেন : ও'ত আমাকে বলল দাদা , তুমি এদের নিয়ে যাও । আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জায়গাজমি বেচে দিয়ে চলে আসব । এখনে আর হিন্দুদের থাকা নিরাপদ নয় । মেয়ে বড় হচ্ছে । কোনদিন বাড়ি ফিরে শুনব - এসে তুলে নিয়ে গেছে ।

সীতারাম : তা'বটে । বাবার মন ত' । ঠিক কাজই করেছে । তাহলে এখনত তুমিই এদের গার্জেন । তা রাজেন, তোমার ভগ্নীর নামটা কী যেন ?

রাজেন : রানী । রানীবালা গোপ ।

সীতারাম : কত বয়স হল ? কুড়ি বাইশ ?

রাজেন : এই সবে আঠারোয় পা দিয়েছে, গত জষ্টি মাসে ।

সীতারাম : তাহলে ভোটার লিষ্টে নাম তুলতে কোনো অসুবিধাই হবে না । বেশ বেশ । তা তোমার কাছেই ত উঠেছে ?

রাজেন : আজ্ঞে হ্যাঁ ।

সীতারাম : রাতে বিছানায় শুয়েছিল ?

রাজেন : এ্যাঁ ?

সীতারাম : আহা ঘাবড়াচ্ছ কেন ? বিডিও আপিসে সব বৃত্তান্ত জানাতে হবে ত ।

রাজেন : সেই জনাই'ত আপনার দোরে আসা সীতারামদা । পঞ্চায়েত বিডিও থেকে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত সবাই আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে ।

সীতারাম : তা কাগজে লেখাতে গেলে জাত কী লিখব ?

রাজেন : সদগোপ । গয়লা ।

সীতারাম : তফসিলি সার্টিফিকেট ?

রাজেন : সেটা অবশ্যই চাই ।

সীতারাম : মা রানীবালা . . .

রানী : জী ?

সীতারাম : সকাল থেকে ত কিছু খাসনি । ওরে, মেয়েটাকে এক গ্লাস জল আর দুটো বাতাসা দিয়ে যা ।

রানী : না, না । আমি এখন পানী খাব না ।

সীতারাম : তা ঠিক । আমি ত ভুলেই গিয়েছিলাম রোজার সময় সূর্য না ডোবা অন্দি জল পর্যন্ত খাওয়া নিষেধ ।

রাজেন : আপনি এ কি বলছেন সীতারাম'দা !

সীতারাম : চুপ রও হারামজাদা । সীতারাম মোড়লের চোখে ধুলো দেবে ? কাল যে গরুর পালের সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে বর্ডার পার হলি, তখন আসতে আসতে সলাপরামর্শ করছিলি না বাড়িতে কী পরিচয় দিবি ? আমি সব খবর পাই রে উল্লুক । মা ছাড়া মোচলমান মেয়েটাকে ত কিনে এনেছিস । বাপ্ আর একটা বিয়ে করেছে । ঠিক কিনা ? ভগ্নীর জন্য দরদ উথলে উঠেছে, না ? ওরে তোর মেয়েচালানীর ব্যবসা কি আমার অজানা ? তুই এটা ভাবলি কি করে ? শোন্ আমি যখন কথা দিয়েছি কাগজপত্র বৈধ সব করে দেব । তারপর সেটা দেখিয়ে বসে, দিল্লী মেয়েটাকে যেখানে ইচ্ছে বেচে দিগে যা । তবে তার

আগে আমার ভাগ চাই । সাতদিন মেয়েটা আমার বিছানায় শোবে । ভেতর বাড়ীতে নয়, বার বাড়ীতে ।
তুই বলবি তোর বাড়ীতে বৌ-এর কলেরা হয়েছে তাই ছোঁয়াচ এড়াতে তোর ভাগ্নীকে সাতদিন আমাদের
বাড়ী রেখে যেতে চাস । সাতদিন পরে কলেরা ভালো হয়ে গেলে নিয়ে যাবি । আমিও পঞ্চায়েতের কাগজ
দিয়ে দেব ।

রাজেন : সে আমি আর কি বলব দাদা । আপনি যা ভাল বুঝবেন ।

সীতারাম : তুই অবশ্য আমার কথা না'ও শুনতে পারিস । সেক্ষেত্রে আমি মেয়ে পাচারের খবরটা খানায়
জানিয়ে দেব - বাকিটুকু পুলিশই করবে ।

রাজেন : না না -- আপনি যা বলবেন তাই হবে ।

সীতারাম : তাহলে যা বললাম তাই কর । আজ রাতেই পাঠিয়ে দে ।

(বাইরে গলা শোনা যায় - রমলা (৪৫) সীতারামের স্ত্রী আর ছেলে (২০-২২) চন্দন, ঢোকে)

সীতারাম : রমলা এসে পড়েছ - ভালই হয়েছে । দেখ দিকি, আমি কী ফ্যাসাদে পড়লাম । রাজেনের বাড়ি
ওর ভাগ্নী বর্ডার পুলিশকে না জানিয়ে বাংলাদেশ থেকে ওর কাছে বেড়াতে এসেছে । এদিকে রাজেনের
বৌ-এর কলেরা হয়েছে । যদি ওরও ছোঁয়া লেগে কলেরা হয় তাহলে ত ভীষণ বিপদ - সবাইকে ধরবে
। তাই ভাগ্নীকে কদিন আমাদের বাড়ি রাখতে চায় ।

রমলা : কেন ? আর কোনো চুলো নেই ? তোমার স্বভাব-চরিত্র কি রাজেন ঠাকুরপো জানে না ?

রাজেন : কী যে বলেন বৌদি ! দাদা দেবতুল্য মানুষ । আমি ভাবছিলাম কি - আপনাদের বারবাড়ির ঘর দুটো
এমনিই খালি পড়ে রয়েছে । তার একটাতে যদি ভাগ্নীটা কদিন থাকতে পায় তাহলে বিপদ কেটে গেলেই
আবার আমি আমার ঘরে নিয়ে যাই ।

সীতারাম : চাঁদু না হয় কদিন ভেতরের ঘরেই শোবে । আমি না হয় এই বাইরের বসবার ঘরেই একটা মশারি
টাঙ্গিয়ে নেব ।

রমলা : (জনান্তিকে) কেন তোমার এত পরোপকার আমি কি তা জানি না ভেবেছ ? (রাজেনকে উদ্দেশ্য
করে) - আচ্ছা ঠাকুরপো, তোমার জামাইবাবুর কী জাত ?

রাজেন : (হকচকিয়ে যায়) জাত কী ? মানে ? আমি আর কী বলব ?

রমলা : কী মানে কী জাত ? এত হেদিয়ে পড়ার কি আছে ? ভেতরবাড়ীতে ঠাকুরঘর আছে । দেখ বাবু
মেয়ে কেমন লক্ষ্মীমন্তু -- আমার কিন্তু বেশ ভাল লেগেছে । এই মেয়ে তোর নাম কিরে ।

রাণী : রাণীবালা গোপ ।

রমলা : গোপ । তার মানে আমাদের পালটি ঘর । চল মা, ভেতরের ঘরে চল ।

রাজেন : বৌদি, আপনি আমায় বাঁচালেন ।

রমলা : এখনও পুরো বাঁচেনি । ছেলেও ত রয়েছে । সেও বাপের মতন পরোপকারী । চল কপালে থাকলে
বাঁচবি । পাড়াগায়ের সোমন্ত মেয়েদের অনেক বিপদ । শৌচ করতে গেলেও শয়তানরা পিছু নেয় ।

(রাণীকে নিয়ে রমলা ভিতরে চলে যায় । ছেলে চাঁদু অর্থাৎ চন্দনও চলে যায়)

রাজেন : সীতারামদা - তাহলে সেই কথাই রইল । সাতদিন পরে আমি মাল ফেরত পাচ্ছি কাগজপত্র
সম্মত । আমি মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব । খালেদা, চল ।

সীতারাম : এই মেয়েছেলেটা ওপারের আড়কাঠি তাই না ?

রাজেন : (শ্রান্তভাবে) সীতারামদা, তুমিত সবই জান । খালেদার সঙ্গে চুক্তি ও বর্ডার পার করে দেবে ।
সোমন্ত মেয়ে একা বর্ডার পার হলে সিক্যুরিটি নির্ধাৎ সন্দেহ করবে মেয়ে পাচার করছে । চলবে
খালেদা । সঙ্গে হলে ফিরে যাবি ।

(রাজেন, খালেদা বেরিয়ে যায় । স্টেজ অন্ধকার হয়ে যায়)

[দৃশ্য দুই]

(একটা খড়ের ছাউনি । রাখালদের বিশ্রামের জায়গা । বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটা তারের বেড়া দেখতে পাওয়া যায় । চন্দন তার এক বন্ধুর সঙ্গে বসে মদ খাচ্ছে)

চন্দন : রামের বোতলটা কোথা থেকে নিয়ে এলি রে পান্না, এক চুমুক দিলেই মাথাটা চড়াং করে ওঠে ?
পান্না : মিলিটারি - ক্যান্টিনের 'রাম'। দারুণ সস্তা ।

চন্দন : ওদের থেকে কী করে জোগাড় করলি ?

পান্না : আরে ক'জন সোলজারের সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেছে । পাঞ্জাবী শিখ । ওদের খাঁটি দুধ খাওয়া অভ্যেস । এক একজন দু'সের করে দুধ খায় - রোজ । আমি ওদের দুধের জোগান দিই । পয়সার ত প্রশ্নই নেই । তবে ওরা বদলি ক্যান্টিনের রাম ক্যান্টিনের দামেই দেয় । কী কড়া ! কোনো ভেজাল নেই । একদম জ্বলতে জ্বলতে নাবে ।

চন্দন : বুঝলি পান্না। কাল মেয়েটাকে দেখবার পর একদম মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে । মেয়েটাও খুব শান্ত রে । কিন্তু মা সারাক্ষণ আগলে নিয়ে বেড়াচ্ছে । ঠাকুরঘরে পযযন্ত পাশে বসিয়ে রাখে ।

পান্না : ঠাকুর ঘরে ? বলিস কিরে ! জানিস না, মেয়েটা মুসলমান ?

চন্দন : মেয়েটা মুসলমান ? কে বলল ?

পান্না : কেন, রাজেন কাকা বলেনি ? পরশু সন্ধ্যায় ত ওরা ধরা পড়ে গিয়েছিল । মিলিটারিরা রাজেনকাকা আর বাংলাদেশের বুড়িটাকে বাইরে দাঁড়াতে বলে এই মেয়েটাকে নিয়ে ভেতরে ঢোকে । হঠাৎ জি ও সি'র ফোন এলো “তৈরি থাক । একটা রেড হবে । ” তখন তাড়াতাড়ি মিলিটারিরা মেয়েটাকে বার করে আমাকে বলে জলদি নিয়ে যেতে । ওই জি ও সি'র জন্যই মেয়েটা বেঁচে গেল ।

চন্দন : তুই ঠিক বলছিস ? আমি মা'কে গিয়ে এখনই বলছি । মুসলমান শুনলে মা মেয়েটাকে এখনই তাড়িয়ে দেবে । তারপর পান্না ... আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না রে ।

(রাজেন ঢোকে, পান্না আর চন্দন মদের বোতলগুলো একটু আড়াল করে)

রাজেন : এই যে চন্দন । তোমাকেই তোমার বাবা মা খোঁজ করছেন । আমাকে একজন খবর দিলো তোমরা এদিক পানে এসেছ, তাই ছুটতে ছুটতে আসছি । আজ একটু পরেই তোমার বাবা মা তোমাদের মামাবাড়ি নয়নচাঁপায় রওয়ানা হচ্ছে । তোমার মেজমামা মোবাইল করেছিল । তোমার দিদিমা মরমর । শুনে অবধি তোমার মা'র চিন্তা রাণীবালার কী হবে । পারলে সঙ্গে নিয়ে যায় । আমি বললাম তোমায় কিছু ভাবতে হবে না । আমি রইলাম । চন্দনও রয়েছে । তোমরা নিশ্চিত মনে যাও । ওর কোনো অযত্ন হবে না ।

চন্দন : রাজেন কাকা ? মা বাবা কি রওনা হয়ে পড়েছে ?

রাজেন : তা এতক্ষণে বোধহয় রওনা হয়ে গেছে । আমি ত ওদের বলে বুঝিয়ে এসেছি চাঁদুকে আমি খবর দিয়ে দেব । তোমরা ভেবনি । তাড়াতাড়ি রওনা হতে পারলে হয়ত বুড়িকে একবার শেষ চোখের দেখা দেখতে পেয়ে যেতেও পার ।

চন্দন : পান্না, আমি আসছি । বাড়িতে মোবাইলটা ফেলে এসেছি ।

(চন্দন বেরিয়ে যায়)

পান্না : এটা তুমি কী করলে রাজেন কাকা ?

রাজেন : যা যা, জ্ঞান দিসনি । দে বোতলটা দে । (বোতল নিয়ে ঢকঢক করে খায়) মেয়ের দালালী করি বেশ করি । ওই হারামী সীতারামটা কী করে ? প্রতি বছর পঞ্চময়েতের বাজেটের সবটা টাকাই মেরে

দেয়। পাটি কিছু বলে না। ওদের স্রেফ ভোট চাই। গাঁয়ে একটা পাকা রাস্তা হল না। চাষীদের ধান মাঠে পড়ে নষ্ট হয়। ফসল নষ্ট হয়, আলু পচে যায়। যদি গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে একটা পাকা সড়ক থাকত আমরা আমাদের ফসল কোল্ডস্টোরে রাখতে পারতাম। শহরে গিয়ে বেচতে পারতাম। আমাদের কি এই হাল থাকত রে? সব সীতারামদের মত হারামীদের জন্য।

পান্না : তা চন্দনকে মেয়েটার পিছনে ছেড়ে দিলে কেন?

রাজেন : মেয়েটা কী জাতের তা ত জানিস।

পান্না : হ্যাঁ, মুসলমান।

রাজেন : এ ক'বছরে কটা মুসলিম পরিবার আশেপাশের পাঁচটা গ্রামে এসে বসেছে জানিস?

পান্না : হ্যাঁ। অনেক। দুটো মাদ্রাসাও খুলেছে।

রাজেন : এখন রোজার মাস। চন্দন মেয়েটাকে ভোগ করার পর মেয়েটার জাতের আসল পরিচয় ওই মুসলমান পল্লীগুলোতে দিয়ে আসবে। ওরা ত মুখিয়েই আছে। এক একজনকে এপারে আসতে সীতারামকে কম টাকা দিতে হয়েছে! ওরাও চায় সীতারামের বদলে কোনো মুসলমানকে পঞ্চায়ত প্রধান করতে, তাহলে দলে দলে লোক এপারে চলে আসতে পারবে।

পান্না : ওরা কী করবে মনে হয়?

রাজেন : কী করবে আবার? জোর করে চন্দনের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দেবে। যদি সীতারাম বা সীতারামের বৌ বাধা দেয়, রায়ট বাধবে। পাটি রায়ট চায় না। পাটি চায় শান্তিতে ভোট জেতা। সীতারামকে হয় পাটির কথা শুনে নিজের ছেলের সঙ্গে মুসলমান মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। আর না হলে গদি ছাড়।

পান্না : রাজেন কাকা, তোমার তুলনা নেই। আমি ভাবতাম তুমি একটা হারামী। কিন্তু তুমি পেটে পেটে এত ধর। তোমার পেটে ত দশটা হারামীর এলিম। চল চল দেখি ওদিকে কি হল?

(স্টেজ অন্ধকার হয়ে যায়)

[দৃশ্য তিন]

(গ্রামের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার শ্রীকান্ত ঘোষের কোয়ার্টার। সন্ধ্যাবেলা খুব ব্যুষ্টি হচ্ছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকচ্ছে। ঘরে শ্রীকান্ত ঘোষ ও তার বন্ধু প্রবাল রায়। দুজনেরই বয়স ৩০ বছরের কাছাকাছি।)

প্রবাল : তুমি চাকরিটা ছেড়েই দেবে ঠিক করলে শ্রীকান্ত?

শ্রীকান্ত : হ্যাঁ ভাই। মানাবার অনেক চেষ্টা করলাম, পারলাম না। নির্লজ্জতার একটা সীমা থাকা উচিত। কিন্তু এই রাজনীতিবিদরা সেটাকে কবেই বিসর্জন দিয়েছে। তুমি জান, আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ি এই গ্রামেই। এখান থেকেই তিনি দুবার দাঁড়িয়ে জিতেছেন। অথচ গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য এতটুকু কিছু করেননি।

প্রবাল : সেটা কিভাবে?

শ্রীকান্ত : মন্ত্রীর বাড়ির লোকজন এমনকি কাজের লোকদেরও অসুখ-বিসুখের চিকিৎসার জন্য এখানকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারদের দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হয় -- 'এই চিকিৎসা এখানে সম্ভব নয়, একে অ্যাটেন্ডেন্টসহ সাউথ ইন্ডিয়ান চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে অথবা ভেলোরে পাঠান অত্যন্ত জরুরী, রুগীর জীবনের স্বার্থে।' ভেবে দেখ - সদর হাসপাতাল নয়, এমনকি কোলকাতার কোনো বড় হাসপাতাল বা মেডিক্যাল কলেজ নয়, একেবারে সোজা ভেলোর। আর অর্থমন্ত্রকও যাকে বলে যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে এই বিশেষ খাতের বরাদ্দ টাকা সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর করে দেয়। নিখরচায় তিরুপতী দর্শন ও

ইডলি ভক্ষণ ।

প্রবাল : এটা ত সরকারী সিদ্ধান্ত । এর জন্য তুমি চাকরি ছাড়বে কেন ?

শ্রীকান্ত : ঠিক । আমি সরকারি চাকর । সরকারি সিদ্ধান্তের কি করে বিরোধিতা করব । যদিও সরকার চালায় পাটি । কিন্তু ... (একটু উত্তেজিত হয়ে পড়ে উঠে পায়চারি করতে আরম্ভ করে দেয়) তুমি ত দেখেছ এখানকার রাস্তাঘাটের অবস্থা । শীতকালে ছাড়া কোনো সাধারণ চারচাকার গাড়ী এদিকে আসতে পারে না, রাস্তা বলে কিছু নেই'ই । ক'দিন আগে, এই ঘোর বর্ষায় নদীর জল উপছে উঠে পাড় ভাসিয়ে দিয়েছিল । নদীর ধারের লোকগুলো স্কুলবাড়ী মাদ্রাসায় এসে উঠেছে । সেই সময় আমাদের মন্ত্রী মিলিটারিদের উঁচু গাড়ী করে বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে আমাদের সুরুলগাছি গ্রামে এসেছিলেন । মিলিটারির কাছ থেকে সরকারী কাজে গাড়ী নেওয়া হয়েছে, ব্যাপারটা অফিসিয়াল করতে তিনি স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও একবার এলেন । ঠিক সেই সময় আউটডোরে এক ডেলিভারির জন্য ভর্তি হতে আসা রুগীর তড়কা আরম্ভ হল সাংঘাতিক এক্সাম্পশিয়া । আমি কোনোমতে একটা ড্রিপ চালু করে ওনাকে অনুরোধ করলাম, রুগীকে কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য । মন্ত্রী মশাই বললেন, তিনি পারবেন না ।

প্রবাল : সে কী ?

শ্রীকান্ত : হ্যাঁ । তিনি পরিষ্কার বললেন, এই গাড়ি নিয়ে তিনি একটি জরুরী কাজে এসেছেন । সে কাজটি না হওয়া পর্যন্ত তিনি যেতে পারবেন না । তিনি দুঃখিত । আমি যেন অন্য ব্যবস্থা করি ।

প্রবাল : একটা সাংঘাতিক এমার্জেন্সি রুগীকে সদর হাসপাতাল পৌঁছে দেবার চেয়ে আরও জরুরি কী কাজ থাকতে পারে ?

শ্রীকান্ত : ওনার বিলেত ফেরত ফটোগ্রাফার ভাগনে এখানকার লোকে কি করে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছে তার ডকুমেন্টারি ছবি তোলা বরাং নিয়ে এসেছে । সরকারি স্পনশরশিপেই সেই ছবি তোলা হচ্ছে । এখনও অনেক কিছু ছবি তোলা বাকি । সে সব না তোলা হলে তিনি যেতে পারেন না । ... আমি আর থাকতে না পেরে বলে ফেললাম 'তাহলে স্যার ওনাকে এইখানেও একটু শুটিং করে যেতে বলুন না - একদম খাঁটি জিনিষ দেখাতে পারবেন - অভিনেতারারও অনেক কিছু শিখতে পারবে ।' মন্ত্রী মশাই চোখ লাল করে কথার উত্তর না দিয়ে চলে গেলেন ।

প্রবাল : মেয়েটির কী হল ?

শ্রীকান্ত : এই জল বৃষ্টি কাদায় হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে বাঁশের উপর থেকে বুলিয়ে লোকে যেভাবে শুয়োর মেরে নিয়ে যায় সেইভাবে বাড়ির লোকে মেয়েটাকে তিন কিলোমিটার রাস্তা হয়ে নিয়ে এসেছিল । বর্ষায় পা ছাড়াও আর কিছু চলবে না । আমি বাধ্য হয়ে বললাম আমার পক্ষে যা সম্ভব ছিল করেছি - এবার সদর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে । ড্রিপের বোতলটা নিয়ে চলো আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব । বিবেকটা যে এখনও মেরে ফেলতে পারিনি, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে দু কিলোমিটারের বেশি পথ হাঁটতে হয়নি । মেয়েটা শেষ হয়ে গেল । রাস্তা ঘুরে শাশান পর্যন্ত ওদের পৌঁছে দিয়ে আমি যখন ফিরে এলাম তখন শুনি মন্ত্রীমশাই এসে আমায় 'শো কজ' করেছেন -- স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে কাউকে কিছু চার্জ না বুঝিয়ে আমি কেন চলে গেছি ? ভাগনেকে দিয়ে আমার অনুপস্থিতির ছবিও তুলিয়ে রেখেছেন ।

প্রবাল : এরপরও ওই লোকটা নিজেকে জনদরদী বলে পরিচয় দেবে । সরকারী খরচে দেহরক্ষী নিয়ে ঘুরবে । ওর ভাগনে গ্রামবাংলার দুর্দশার ছবি তুলবে ; সেই ডকুমেন্টারির ভিত্তিতে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ঋণ দেবে । আর সরকার জনদরদী বলে নাম কুড়াবে । না শ্রীকান্ত আমার কিছু বলার নেই ।

শ্রীকান্ত : আমার এখনও একটু বলার আছে । ঘটনাটা দেশপ্রেমের আর্কাইভে স্থান পাওয়ার যোগ্য । তুমি গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান সীতারাম মন্ডলকে চেন ? আরে গতকাল ওরই বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে ত এলাম ।

প্রবাল : সীতারাম কী দেশপ্রেমের পাঠ পড়াচ্ছে ?

শ্রীকান্ত : শোনই না । আজ রবিবার তার আগের মঙ্গলবার এই সময়ই সীতারামের ছেলে তার বউকে নিয়ে এসেছিল । ওদের বিয়েতে অনেক গোলমাল হয়েছিল । মেয়ে নাকি মুসলমান । বাংলাদেশ থেকে এসেছিল । দুজনকে এক সঙ্গে এক ঘরে পাওয়া যায় । গ্রামের মুসলমানরা সব একজোট হয়ে সীতারামকে বলে যদি সীতারামের ছেলের সঙ্গে ওই মেয়ের বিয়ে না দাও রায়ট বাঁধবে । সীতারামকে শেষকালে পাটি থেকে চাপ

দিয়ে এই বিয়ে হয় । যাই হোক, ওদের কথাবার্তা শুনে বুঝলাম মেয়েটির পেটে বাচ্চা এসেছে । পরীক্ষা করে দেখলাম ৮ মাসের বাচ্চা পেটে রয়েছে । ছেলেটা বলছে এই বাচ্চাটা নষ্ট করে দিতে । বাড়ীর লোকেরাও চাইছে না ।

প্রবাল : সে কী ! আটমাসের বাচ্চাকে নষ্ট করে দেবে ! কেন ?

শ্রীকান্ত : শিশুর শাশুড়ীর ভয়ঙ্কর আপত্তি । ছেলেটার অত কিছু অমত নেই বরং বাবা হবার জন্য একটা ঔৎসুক্য রয়েছে । আমি একবার ভাবলাম লিখে দিই এখানে চিকিৎসা সম্ভব নয় । সাউথ ইন্ডিয়ায়, বিশেষ করে ভেলোরে প্রশাসনিক স্তরে এফ্ফুনি কথাবার্তা হওয়া উচিত যাতে কাজটা ঠিকভাবে হয়ে যায় । কিন্তু মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের পেশাটাকে অত নীচে নামাতে পারলাম না ।

প্রবাল : মেয়েটির বয়স কত হবে ?

শ্রীকান্ত : টেনেটুনে ১৯ । এরই মধ্যে শরীরে একজনকে ধরেছে । বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে সারাক্ষণ কেঁদে যাচ্ছে । জান প্রবাল, ওর মনটাকে একটু ঘোরাবার জন্য এদিক সেদিক গাঁয়ের কথা লোকের কথা আর পাঁচটা কথা বলার পর দেখলাম একটু সহজ হল । সাহস করে কথা বলতে শুরু করল । আমি জিজ্ঞেস করলাম তুমি বাড়ির কাজ কী কী জান ? ও বলল, রাঁধতে জানি । তা কী রান্না করতে পার ? ও বলল, সব । কিন্তু এখানে কিছুই রাঁধতে দেয় না - মা'বাবা ত আমার হাতের ছোঁয়া খান না । ব্যাপার অন্যদিকে যেতে পারে ভেবে আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলাম রান্না বাদে আর কী জান ? বলল, গান করতে জানি । কার কাছে শিখলে ? ইস্কুলের দিদিমণিদের কাছে । একটা গান শোনাবে ? প্রবাল, ও কি গান গাইল জান ? গাইল 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা ।' প্রবাল, বহু লেখায় ভারতমাতার বর্ণনা পড়েছি । অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ভারতমাতা দেখেছি । কিন্তু আমার দেখা ভারতমাতাকে তোমরা কেউ উপলব্ধি করেছ কিনা জানি না । যার সন্তানকে দেশের লোকেরা সবাই মিলে নষ্ট করতে চাইছে - ভূমিষ্ঠ হতে দিতে চাইছে না, সে গাইছে 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা ।' যদি গান শুনে এই পাষণ হৃদয়ে একটু করুণার সঞ্চার হয় - যদি তার সন্তানকে নিরাপদে জন্ম দিতে বাধা না দেয় । আমি জীবনে এর চেয়ে স্বর্গীয়, এর চেয়ে করুণ দৃশ্য কখনও দেখিনি, ভাবিনি ।

প্রবাল : শেষ পর্যন্ত মেয়েটির বাড়ির লোকজন রাজি হল ?

শ্রীকান্ত : আমি ত অনেক বোঝালাম । ভয়ও দেখালাম । মেয়েটির কোনো ক্ষতি হলে আমি পুলিশ ডাকব, সাক্ষী দেব । জানি না কী হবে । অনেক রাত হল । চল মশারি টাঙিয়ে শুয়ে পড়া যাক ।

প্রবাল : তোমার কথা শুনে আমি বুঝতে পারছি কেন আমাদের দেশে এত মা বাচ্চার জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায় । মাতৃত্ব মায়ের সর্বস্ব । আবার মাতৃত্বই মায়ের সর্বনাশ । চল ।

(প্রবাল মশারি বার করে টাঙাতে যায়, এমন সময় বাইরে হল্লা ওঠে -- ডাক্তারবাবু শিল্পীর দরজা খুলুন । শ্রীকান্ত তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেয় । দড়ির খাটিয়ায় রানীবালাকে শুইয়ে কয়েকজন ঢোকে । সীতারাম, চন্দন, রাজেন, পান্না আরও কয়েকজন । একটু পরেই গফুরও এক মুসলমান সঙ্গীর সাথে ঘরে ঢোকে)

শ্রীকান্ত : কী ? কী হয়েছে ?

চন্দন : আমি চাই নি, বাবা শুনল না । আজ জোর করে রানীকে ওঝার দেওয়া জড়িবুটি সেক করে খাইয়ে দিয়েছে । তার কিছুক্ষণ পর থেকেই রক্তস্রাব । এখন কথাও বলছে না । জলও গালের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে ।

সীতারাম : ডাক্তার, মেয়েটির যাতে ঠিকমত চিকিৎসা হয় তারজন্য তুমি সম্পূর্ণরূপে দায়ী রইলে । ওর আউটডোর টিকিটে তোমার ভর্তি লেখা উচিত ছিল ।

গফুর : আল্লার কসম সীতানাথ মোড়ল । যদি মেয়েটার কিছু হয় রায়ট বাঁধবে ।

শ্রীকান্ত : (ড্রিপ লাগাতে লাগাতে) বাঃ বাঃ সীতানাথ মোড়ল । বাঃ গফুর মিয়াঁ । এখনও সেই দর কষাকষি ! মেয়েটার পেটের বাচ্চাটাকে নষ্ট করে দেবার বেলায় ত কেউ বাধা দিলে না । মেয়েটা মরতে বসেছে , এখনও তার মরা দেহটার ওপর রাজনীতির ভোজের পাত পাড়ছে, না ? এখানে একটা ড্রিপ দেওয়া ছাড়া

আর কিছুই করা সম্ভব নয় । একে এখুনি সদর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে । তোমাদেরই নিয়ে যেতে হবে ।

গফুর সীতারাম একসঙ্গে : এই বৃষ্টির মধ্যে ? পায়ে হেঁটে অতটা পথ ?

শ্রীকান্ত : হ্যাঁ গফুর, হ্যাঁ সীতারাম । রাস্তা বানাবার সব টাকা খেয়ে ফেললে আজ বৃষ্টির রাতে পা ছাড়া আর কোনো গতি থাকে না । গফুর, তুমি খাটের সামনের পায়ায় কাঁধ দাও । সীতারাম তুমি এসে খাটের পিছনের পায়ায় কাঁধ দাও । রাজেন, পান্না তোমরাও কাঁধ লাগাও । চন্দন, তুমি টর্চটা ধর । যদি কপালে থাকে তাহলে ও বেঁচেও যেতে পারে । আমি ড্রিপটা ধরছি ।

গফুর : আর যদি যেতে যেতে মরে যায় ?

শ্রীকান্ত : তাহলে আমরা খাটটাকে সেখানেই নামিয়ে একটা সাদা চাদরে শরীরটা ঢেকে দিয়ে ভোরের অপেক্ষা করব । রাতের অন্ধকারের শেষে যখন ভোরের প্রথম আলো ওই চাদরটাকে স্পর্শ করবে তখন তোমরা দুজনে একসাথে আস্তে আস্তে চাদরটাকে সরিয়ে দেবে । যদি আমরা ভাগ্যবান হই দেখতে পাব ওই শরীরটার জায়গায় ফুটে রয়েছে রাশি রাশি পদ্ম আর গোলাপ ফুল । তোমরা খুব যত্ন করে মন্দিরের আর মসজিদের সামনে গাছগুলোকে পুঁতে দেবে । জানবে মায়ের আশীর্বাদ । এরপর থেকে সব কাজের শুরুতে হিন্দু মুসলমান সবাই এক মায়েরই আশীর্বাদ নিতে দাঁড়াবে । আর যদি দেখি শুয়ে থাকা মায়ের শরীরটা যেমনকার তেমনই রয়ে গেছে তাহলে সীতারাম, গফুর ; ১৯৪৭ সালের মত আবার টাঙ্গির কোপে তাকে দু টুকরো করে এক ভাগ গোর দিও আর অন্যটা চিতায় পুড়িয়ে দিও । প্রবাল . . .

প্রবাল : কী ?

শ্রীকান্ত : তুমি ত ভাল গাইতে পারতে । এই মেয়েটা আমায় যে গানটা শুনিয়েছিল - চল আজ যেতে যেতে ওকেই সেটা আমরা শোনাই ।

(সবাই আস্তে আস্তে খাটটাকে তুলে দাঁড়ায় । প্রবাল গান ধরে, অন্যরা একে একে গলা মেলায়)

প্রবাল : ওমা, অনেক তোমার খেয়েছিগো

অনেক নিয়েছি মা ।

তবু জানিনে যে কী বা তোমায় দিয়েছি মা ।

আমার জনম গেল বৃথা কাজে

আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে

তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা

ও আমার দেশের মাটি - তোমার পরে ঠেকাই মাথা ।

(একে একে সবাই বেরিয়ে যায় । পর্দা পড়ে যায়)